আজকের কাগজ

তারিখ 26 APR 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

17

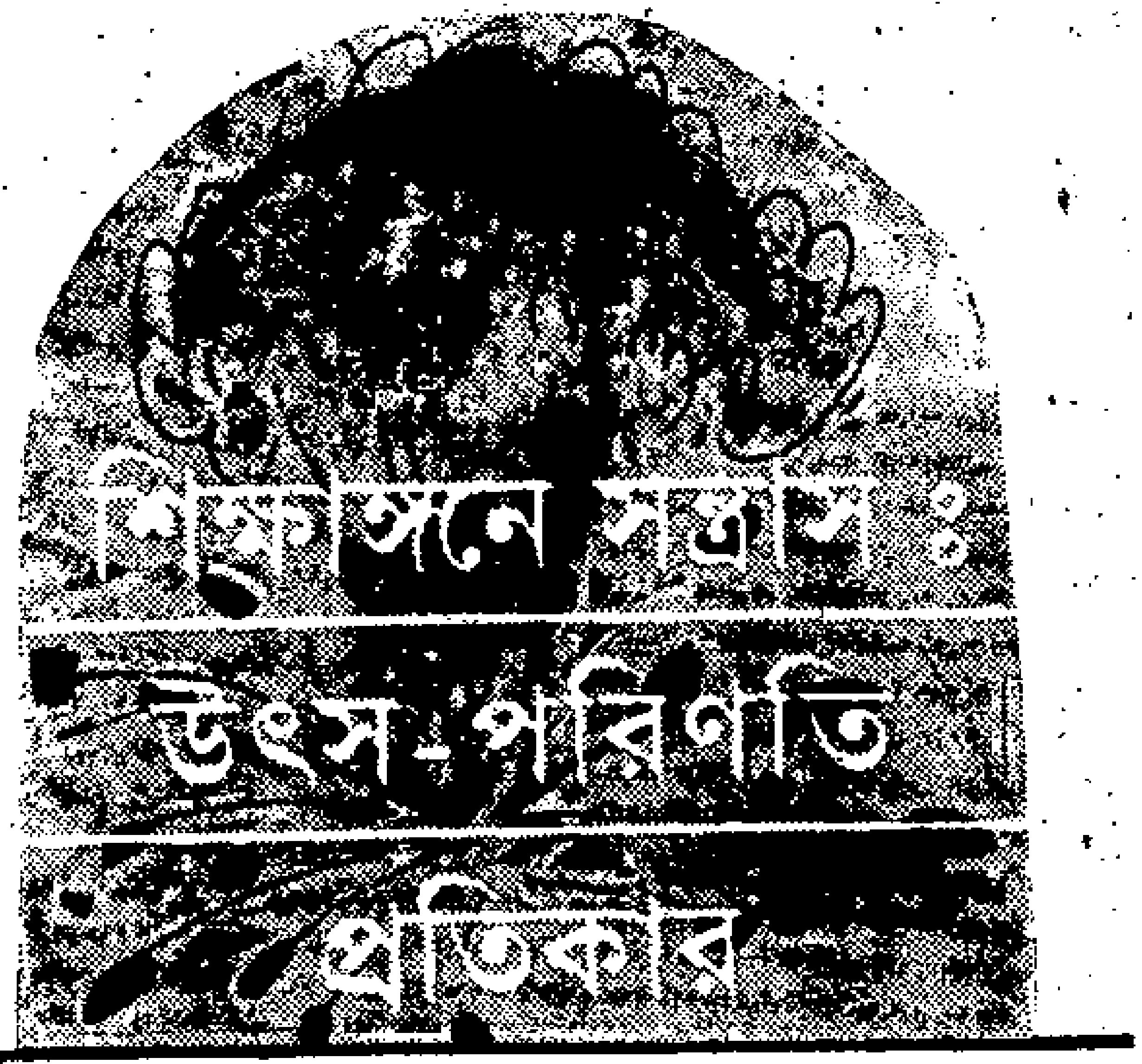

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ঃ উৎস-পরিণতি প্রতিকার

সৈয়দ কামরুল আহ্সান

পূর্ব প্রকাশের পর

কেবলমাত্র "মার্সেলম্যান" সন্ত্রাসীরাই এই অর্থ পেয়ে থাকেন, যার ফলাফল হিসেবে কিছুদিন আগে একটি হত্যাকাণ্ডের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বলেই আমি ও দেশবাসী দুঃখের সাথে প্রত্যক্ষ করেছি। যতদূর জানা যায় এই 5% above cost সন্ত্রাসীদের মধ্যে বিতরণ করার নিয়মটি সন্ত্রাসীর একটা নীল নক্সা। '৯০ পরবর্তী যা আজো বর্তমান।

সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষকতা করা নষ্ট রাজনীতিরই একটি অংশমাত্র। কেননা এটা একটি "সন্ত্রাসী ইনসেন্টিভ" বলেই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পরিচিত। নিকট অতীতে দেখা যায় বিএনপি'র সমর্থনপুষ্ট ছাত্রদলের অন্যতম সংগঠক যিনি দলের হল শাখার নাট্য সম্পাদক সদ্যপ্রয়াত জিন্নাহ্। এ রকম একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রকাশ্য দিবালোকে রেজিস্টার বিল্ডিং নামেও পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনে বিরুদ্ধ গ্রুপের গুলিতে নিহত হন। এই ঘটনায় প্রশাসনিক ভবনের কার্যপরিচালনায় দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তা ব্যক্তিরাও আক্রান্ত হন। সমগ্র দেশবাসীর এই ঘটনা অজানা নয়।

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পরিণতি বিশ্লেষণের আলোকে এটা প্রমাণিত সত্য যে, সন্ত্রাসী তারুণ্য স্বাভাবিক জীবন-যাপন থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর ব্যক্তিক জীবনে নিরাপত্তাহীনতা প্রবলভাবে অনুভব করে আর যে কারণে সন্ত্রাসী নিজেও সন্ত্রাসের নীল ক্যাক্টাসে ক্রমাগত দংশিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে সন্ত্রাসের এই নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে টোকাই থেকে শুরু করে দুই জন রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত নিহত হন। অভ্যন্তরীণ কোন্দলসহ প্রতিপক্ষ গ্রুপের আক্রমণে, প্রতিপক্ষ ছাত্রসংঘঠনের আক্রোশের কারণে ক্রমাগত সন্ত্রাস ব্যাপক পরিধি লাভ করছে। বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে আইনগতভাবে শুধুমাত্র এর সমাধান সম্ভব নয়। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের, প্রতিটি ছাত্র সংগঠনের বিশেষ ভূমিকা না থাকলে মরণক্রীড়া বন্ধ করা আজ প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিক অঙ্গনে ও ছাত্ররাজনীতিতে সন্ত্রাসের পরিণতি কতটা ব্যাপক তার একটা খতিয়ান এখানে সে কারণে তুলে ধরছি। মৃত্যুর তালিকা আর কত দীর্ঘায়িত হবে জানি না। তবে এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যারা প্রতিপক্ষ গ্রুপের কিংবা অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে নিহত হয়েছেন তা অনেকটা নিম্নস্থ;

সংক্ষেপে সন্ত্রাসের কারণে নিহতরা হচ্ছেন সেলিম, দেলোয়ার, ইলিয়াস, কাঞ্চন, বাদশা, শাহ্জাদা, নুরুল আলম, বসুনিয়া, বাবলু, মাঈনুদ্দিন, আসলাম, লিটন, আরিফ, শহীদ (পাগলা শহীদ) মুনিরুজ্জামান বাদল, মুরাদ, মাহবুব, মির্জা, গালিব, জিন্নাহ, আলোকসহ আরো অনেকে।

১৯৮৩ সালের মধ্য ফেব্রুয়ারিতে এরশাদ সরকারের কুখ্যাত শিক্ষামন্ত্রী মজিদ খানের প্রবর্তিত শিক্ষানীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রথম এরশাদ বিরোধী বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য প্রকাশ্য দিবালোকে পুলিশ ও বিশেষ সংস্থার মাধ্যমে ছাত্রহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। এরশাদ কর্তৃক সংঘটিত সেই সকল সন্ত্রাসের দু'একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখযোগ্য। যা "পুলিশী সন্ত্রাস" নামে খ্যাত।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলের উপর পেছন থেকে পুলিশী ট্রাক তুলে দিয়ে এক নব্য সন্ত্রাসের কৌশল প্রবর্তন করেছিলেন এরশাদ। মিছিলে নিহত হয়েছিলেন শহীদ সেলিম-দেলোয়ার যারা ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন। আমরা এই একই কায়দায় জিয়াউর রহমানের শাসন আমলেও সন্ত্রাস ঘটতে দেখেছি। সেক্রেটারিয়েটের সামনে সেদিনও একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলে পেছন থেকে গাড়ি তুলে দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয়েছিলো। তদানীন্তন পুরানো ঢাকার সন্ত্রাসী দিলা-মোখলেসকে এই সন্ত্রাস সংঘটিত করতে দেখেছি যারা জিয়াউর রহমানের ছাত্রদলের নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এইরূপ সরকারী সন্ত্রাসের নিহত হয়েছিলেন জাফর, জয়নাল, ইলিয়াস, কাঞ্চন, শাহ্জাদা, বাদশাহ, নূরুল আলম নূর হোসেন, ফাত্তাহ, নিতাই, ডঃ মিলনসহ আরো অনেকে।

পরবর্তীকালে সন্ত্রাস ছিলো শুধুমাত্র যে কোন লাশ প্রত্যাশী। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের গতিধারা প্রতিহত ও বিচ্ছিন্ন করার জন্যেই অপ্রত্যাশিতভাবে অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো "একটি লাশ আবশ্যক" কেন্দ্রিক সন্ত্রাসের। এরশাদ সরকারের প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসী গ্রুপের মাধ্যমে রাতের আঁধারে তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি মিছিলে সন্ত্রাস করে

পরবর্তী কিস্তি ২৯ এপ্রিল

সৈয়দ কামরুল আহ্সান : প্রাক্তন ভিপি ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদ, একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত।